ভন্ডুলমামার বাড়ি

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

পাড়াগাঁয়ের মাইনর স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেওভালো, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুকলোক। বেশি গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরেদেবলহাটি মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছরকাটিয়ে দিলেন এবং বাকি পনেরোটি বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতেক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্পকরছিলাম। সামনেই একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁতগাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটাগ্রামের বাজারের দিকেগিয়েচে। স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোনো ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তাজানি। একটা গরিব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতেঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠান্ডা পড়েচে—বেশগরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্চে, কিন্তু...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্, যা দিকি একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করেবলগে, দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায়—এক্ষুনি...

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা...

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবুকথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝেবাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎবললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনেপড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয় !...এখানকার লোকজন দেখেচেন তো ?সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোনো চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যেযে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতেপারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমশলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এইপাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজেরদু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয়নাই করেচি...

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথাএখনো ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই,আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁরযা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বরসরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ওই কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়ছে, রঙিনস্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়েপড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বল্‌তে শুরু করলেন।

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামারবাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন ?এখন নেই ?

—সে কথা পরে বল্‌চি। না, এখন নেই ধরে নিতেপারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধআছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়িছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানেযাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামারবাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা।কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়েরছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়াযাবার পথে একটা বড় আম-

কাঁটালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেইবনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথাহচ্চে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখনমামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ওও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা।একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটাকাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায়দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতেছোট-বড় ভাঁট্‌শেওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুন-সুরকি মাখারছোটো খানাতে পর্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বারএসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনো গাঁথা শেষহয়নি তো ?কারা বাড়ি তুলচে ?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনো শেষ হয়নি ?

—তোর এত কথাও মনে আছে !...ও তোর ভন্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।

আমার ভারি কৌতূহল হল, সাগ্রহে বললুম, ভন্ডুলমামাকোথায় থাকে দিদিমা ?ভন্ডুলমামা কে ?...

—ভন্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়।আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাক্‌ত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে-বাড়ির ভাগ্নে, চাকরিবাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই ?তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর শুরু করেদিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম,—তবে বাড়ি গাঁথাহচ্চে না কেন ?মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে ?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না ! যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন, সেই থেকে এই ভন্ডুলমামা ও তাঁরআধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকারকরে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এই ভন্ডুলমামাহয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থানলালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকাপাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমারব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেনএসব হল তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যেখুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভন্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে ?..না, এবার বোধ হয় নিজে আস্‌বে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভন্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা ?দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট ! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল?...তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট ?নে নে, ঘুমুস্‌ তো, আমায় রেহাই দে,স্‌রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে—তোমায় নিয়ে সারারাত গল্প করলে তো চলবে না আমার।

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বলো, যেয়ো না, আচ্ছা মন দিয়ে শুন্‌চি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এইদু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভন্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলেযাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায়আমাদের পুকুরপাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলোযেন অস্পষ্ট, যেন মনে হত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েচে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি

মনে পড়তভন্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়াবনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হলকে জানে ?এতদিন নিশ্চয় ভন্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকাপাঠিয়েচে।

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছলাম। সকালে ওই পথেবেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভন্ডুলমামার বাড়িটাযেমন তেমনি পড়ে আছে ! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশি আরএকটুও এগোয়নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইটেরগাঁথুনির ফাঁকে বট-অশ্বত্থের বড় বড় চারা। আহা, ভন্ডুলমামাবোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর !

ভন্ডুলমামা সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভন্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে।তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারইবয়সি, ভন্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটিরপৈতে হবে সামনের চৈত্রমাসে। সেই সময়ে ওরা দেশেআসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভন্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়িরদোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকেদোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদারশুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতেযাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানকআপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজীকরানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ ! একা টিকিট করে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একাবাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা !

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কি রকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়েআমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতিকষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখিআর উঠতে পারি নে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েছে; সঙ্গেসঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি নালেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটুকেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভন্ডুলমামারবাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্তগাঁথা হয়েচে, কিন্তু কড়ি এখনো বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলুমযে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মতো সেদুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভন্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আরমিস্ত্রি আসেনি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেচে।ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভন্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়িগাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভন্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভন্ডুলমামার বাপআছে ?কে জানে ?তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়িরএপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে ?বোধ হয়উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভন্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদেরউঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে ?ছেলেমেয়েরাছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করে খেলবে, হয়তো বাড়িতেসত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতেসংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলি চেহারা তখন একেবারেবদলে যাবে যে ! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘরলোক বাড়বে...ও পাড়া থেকে খেলা করে ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না...ওদের বাড়িতেআলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কিসের আরতখন ভয় ? দিব্যি চলে যাব।

আরো বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামারবাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভন্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক্হয়েচে কবে, আমি

দেখিনিতো ?রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ ! কেবলএকটুখানি এখনো বাকি, দরজা জানালায় এখনো কপাটবসানো হয়নি। বাঃ, ভন্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল !

ভন্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধারদেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাস-কতকপরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মতো চড়াও হয়ে সুদআদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মতোমামার বাড়িতে আর তত যাই নে, গেলেও এক-আধ দিনথাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়তো দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভন্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে...বনজঙ্গল চারিপাশে আরো গভীরতর, কেউ কোনোদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে বলে মনে হয় না।একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্তি...

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এট্রেন্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজেঢুকলুম। সেবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষ, এফ.এ. দেব, কিএকটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েচি।

বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরেজানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায়প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামিমা বললেন,—এই তোরভন্ডুলমামা, প্রণাম কর।

আমার সে ছেলেবেলার মনের অনেক পরিবর্তন হয়েগিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনেরলোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলান্টিয়ারি করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেছে বদলে, তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরো পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ওকৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভন্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভন্ডুলমামারবয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেইছেলেবেলাকার ভন্ডুলমামা ! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরেফেললুম।

ভন্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটুগায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্মেসেথাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায়জ্বালাতন করে তুললেন। আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরিকরেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবার ম্যাট্রিকদিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না ?

ভন্ডুলমামা বললেন, আনব, শিগ্‌গিরই আন্‌ব বাবা।এখনো একটু বাকি আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায়বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই...সেইজন্যেই তো খেয়ে না-খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ওই একটুখানি যা বাকি আছে...তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনো...এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষকরব।

বলে কি ! এখনো বাকি ! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি, ভন্ডুলমামার বাড়ি উঠছে ! এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচেথেকে দেখে যেতে পারব তো !

ভন্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্যচাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকেতাতেই তো বাড়ি হবে ?এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে

কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর ধরে একটু একটু করেবাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছেবছর সব এনে ফেল্‌ব। জায়গাটা বড় ভালোবাসি।

ভন্ডুলমামা বললেন তো চৌদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তুআমার মনে হল ভন্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলেততকাল ধরে...যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরে ভন্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানিউঠছে...শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকেকিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভন্ডুলমামার বাড়িহয়েই চলেছে...ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভন্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেইদেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভন্ডুলমামাবললেন-এসো একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামিতোমায় দেখলে খুশি হবে। —সামনের রবিবার তোমারনেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভন্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হল। ভন্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যাএকবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসাবরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি, —তা কেউ কি কথা শোনে ?

মামিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানেকেমন করে শুনি ?কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধুসিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে তো মানুষে—তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভন্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেনতার মর্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট-অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজঅনেকদিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান বলেএখনো ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ ?চৈত্র মাসের দিকে না হয় করে দেওয়া যাবে। আর তোমরাসবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনো বাকি। ভন্ডুলমামার বাড়ি এখনো শেষ হয়নি, এখনো কিছু বাকি আছে। কিন্তুএতদিন ধরে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতেঅন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি, ভন্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন।এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতাছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয় দেখাশুনো করতে হয় বলে, একদিন সলজ্জ কৈফিয়তও দিলেন।...পাঁচিল ?হ্যাঁ তাপাঁচিল সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে...সামনেরবর্ষায়...ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড়আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন করে থাকেন ?সারাগাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারেজনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমারযে। দেখো, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষহয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুমরিটায়ার করে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তোচাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায় ?তাই জলাহার করেওসারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় করে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককালে না—এককালেছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতারবাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভন্ডুলমামার কথা আরো সব জানা গেল। ভন্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানাঁয় থাকেন। তাঁর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস, তার ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনো এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা নিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভন্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে ?যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভন্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম করে চেয়েচিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমিক্রমে বি.এ. পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আরযাই নে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ার গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একেমরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরিকরে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িরছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু একদিকেরদোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড়জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে।বিখ্যাত রায়দিঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরুবাছুর কচুরিপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটেদিব্যি পার হতে পারে।

সন্ধ্যারাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায়গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনো পৈতৃক ভিটেতেম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণহতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধরে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরেশৃগালের রব ও নৈশপাখির ডানা ঝটাপটি !

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসাকরেছেন। ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানেএকবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পাধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড় বসানো বাঁশেরবাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি, পরে বুঝলুম।ভন্ডুলমামা এত বুড়ো হয়ে পড়েচেন এর মধ্যে !...শহরেএসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপী বন্ধুবান্ধবজুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তারসুরে ভন্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিতভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিওনিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত। তার আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ করেছে এমন মনে হল না।

আমি গিয়ে ভন্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারেঅচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভন্ডুলমামা খুব খুশিহলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকেআসছেন ?

ভন্ডুলমামা বললেন—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছিআজ বছর পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভন্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়িথেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছুচাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে আনা বড়মামার সেইপুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় শখ হল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হলেও এখনো দু-তিন মাস যাবে।বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে বলে খালিপায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়েদেখলুম শীর্ণকায় ভন্ডুলমামা ভারী চালডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোয় ফটাং ফটাংশব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন

ফিরেএল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকেতুলে দিয়ে আসি। ভন্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতেনিলুম, টিকিট করে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনেওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেয়ো না হেএকদিন, বাড়িটা দেখে এসো আমার—খাসা করেছি—কেবলপাঁচিলটা এখনো যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচইচালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব।দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি...।

ভন্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এরমাস—কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায়দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানির বাড়িতে চাকরিকরে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারেরকৌটো, মুখে একগাল পান—বউবাজারের ফুটপাত দিয়েবেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভন্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললে—বাবা দেশের বাড়িতেইআছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতেরাজী নন। বুদ্ধিসুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারাজীবন যা রোজগার করেছেন, ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজহাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জম্‌ত। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে ?রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়ালোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট-কাঠের দরেও বিক্রি হবে ভেবেছেন ?কে নিতেযাবে, পাগল আপনি ?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখনজাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠেঅন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়িরগাঁথুনিও শেষ হল। কার দোষ দেবে ?

তারপর ভন্ডুলমামার আর কোনো সংবাদ রাখিনি অনেককাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভন্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে কদিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়েযে দেখবে ?এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রামকরা হয়। ভন্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনো মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়তো আর কোনো দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটাআমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে আছে।আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভন্ডুলমামার বাড়িটা একটাকায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে, ঢোক্‌বার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানলার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ থামাল পর্যন্তগাঁথা হয়েছে।

আমার জীবনের সঙ্গে ভন্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি করে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমারগল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিসকেন আমার মনে এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে !

বিশেষ করে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়েএইজন্য যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেইবাড়িটা প্রথম দেখি।

* * * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।